উপসংহার

উপসংহার

মার্ক্সীয় যুদ্ধপৃষ্ঠ প্রতিবেশ ও কল্লোলের আবহে জীবনানন্দ দাশ সাহিত্য-চর্চা শুরু করেছেন। এ দু'য়ের কোনটিতেই জীবনানন্দ সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হননি। মূলত মহানক্ষত্রলোকের ইশারা ও প্রয়োজনীয় ইতিহাস জ্ঞান তাঁর রচনাবৈশিষ্ট্য। তিনি জগৎ-জীবন-সমাজ-সময় ও সভ্যতা বোঝার চেষ্টা করেন এই ইশারা থেকে। জীবনানন্দ বারবার প্রজ্ঞার কথা বলেন, প্রতিভার ও মনস্বিতার কথা বলেছেন। মহাকালের দ্বারে কড়া নেড়ে জীবনানন্দের কবিতা একটি স্থির আসন অর্জন করেছে। তবে কেবলমাত্র কবিতা নয়, ইতিহাস-দর্শন ও অন্যান্য মানববিদ্যায়ও তাঁর পাঠাভ্যাস ব্যাপ্ত ছিল। তাই তিনি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলিতেও (উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ) বিচরণ করেছেন। জীবনানন্দকে তথাকথিত স্মার্ট বলা না গেলেও সমকালীন বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে বিচলিত, ব্যথিত ও চিন্তিত করে তুলেছিল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'রূপসী বাংলা'র কবি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বাস্তব যাচাই করবার নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতাকে। সেই নির্মম বাস্তবের বিস্তারিত বিবরণ বিধৃত হয়েছে জীবনানন্দের উপন্যাসগুলিতে। — একথা অনিবার্যরূপে সত্য যে জীবনানন্দকে উপন্যাস লেখার তাগিদ যুগিয়েছিল সময়ের চাপ ও প্রক্ষোভ।

সামাজিক অর্থে ব্যর্থ মানুষ জীবনানন্দ দাশ। মূলত তিনি পেশায় অধ্যাপক হলেও, তাঁর চাকরি নিরুদ্বিগ্ন ছিল না। বহুবার তিনি চাকরি-হারা হয়েছেন। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে 'স্বরাজ' পত্রিকায় (প্রথম প্রকাশ ২৬ জানুয়ারি, ১৯৪৭) চাকরি নেন তিনি, প্রায় অবৈতনিক ভাবে চাকরি করতে করতে ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝিতে ছেড়ে দেন। এর ফলে তাঁর জীবনে আর্থিক সঙ্কট চরমে ওঠে। সেইসময় জীবনানন্দ তাঁর দ্বিতীয় পর্বের (১৯৪৮) উপন্যাসগুলি লেখা শুরু করেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে তাঁর প্রথম পর্বের (১৯৩১-৩৩) উপন্যাসগুলি ছাপাবার কোন ইচ্ছে তাঁর জাগেনি। সেসময় তাঁর কবিতার বই খুব একটা বিক্রি হত না। তবে তিনি বুঝেছিলেন কথাশিল্পীরা উপন্যাস লিখে বেশ রোজগার করেন। দ্বিতীয় পর্বে তাঁর উপন্যাস রচনার ঝোঁক জাগে এভাবেই। 'ময়ূখ' পত্রিকায় প্রকাশিত (২ জুলাই, ১৯৪৬) একটি চিঠিতে জীবনানন্দ জানিয়েছেন — তিনি দেশী বিদেশী বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস পড়েছেন। ঔপন্যাসিক হবার অনুপ্রেরণা তাঁর মধ্যে আগে থেকেই ছিল, সে আকাঙ্ক্ষা এখনও মুছে যায় নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সচেতনভাবেই জীবনানন্দ উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন। 'Bengali Novel

Today' প্রবন্ধে তিনি ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেরকম সমালোচনা করেছিলেন, তা থেকেও তাঁর উপন্যাস সম্পর্কিত সচেতনতা দৃষ্ট হয়।

রচনার সময়ানুযায়ী জীবনানন্দের উপন্যাসগুলিকে মূলত দুটো পর্বে ভাগ করা যায়। তাঁর তিরিশের দশকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল — 'পূর্ণিমা' (১৯৩১), 'বিভা' (১৯৩৩), 'কারুবাসনা' (১৯৩৩), 'জীবনপ্রণালী' (১৯৩৩), 'প্রেতিনীর রূপকথা' (১৯৩৩) প্রভৃতি এবং চল্লিশের দশকের উপন্যাসগুলি হল — 'মাল্যবান' (১৯৪৮), 'জলপাইহাটি' (১৯৪৮), 'বাসমতীর উপাখ্যান' (১৯৪৮), 'সুতীর্থ' (১৯৪৮)।

কল্লোলীয় লেখকদের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত মূলত রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও ইউরোপীয় সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু তাঁদের এই মনোভঙ্গি মুখ্যত কথাসাহিত্য কেন্দ্রিক। বাংলা কবিতায় এ পরিবর্তন এসেছিল আরও পরে। যাই হোক, জীবনানন্দের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলির রচনাকালে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র কথাশিল্পীদের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে। যেমন – বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া' (১৯৩০), 'রেখাচিত্র' (১৯৩১), 'ধূসর গোধূলি' (১৯৩৩); দীনেশরঞ্জন দাশের 'দীপক' (১৯২৭); গোকুলচন্দ্র নাগের 'পথিক' (১৯২৫); অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'বেদে' (১৯২৮); 'আকস্মিক' (১৯৩০), 'কাকাজ্যোৎস্না' (১৯৩১), 'অধিবাস' (১৯৩২); জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' (১৯৩১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ঝড়ো হাওয়া' (১৯২৩), 'অতসী' (১৯২৫), 'নারীমেধ' (১৯২৮), প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' (১৯২৬), 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩২) ইত্যাদি। — জীবনানন্দ যখন তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি লিখেছেন সে সময় কল্লোলীয় কথাশিল্পীর উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, তবুও তাঁর উপন্যাসের দূর-দূরান্তে কোথায় কল্লোলীয় কথাসাহিত্যের প্রভাব গোচরীভূত হয়নি। কবিতার মতো উপন্যাসেও জীবনানন্দের নিজস্ব চরিত্র চিহ্নিত।

কথাশিল্পী জীবনানন্দের দু-পর্বে বিভক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল — তিরিশের দশকের ঃ 'পূর্ণিমা' (১৯৩১), 'বিভা' (১৯৩৩), 'কারুবাসনা' (১৯৩৩), 'জীবনপ্রণালী' (১৯৩৩), 'প্রেতিনীর রূপকথা' (১৯৩৩) এবং চল্লিশের দশকের ঃ 'মাল্যবান' (১৯৪৮), 'জলপাইহাটি' (১৯৪৮), 'বাসমতীর উপাখ্যান' (১৯৪৮)।

মূলত একইরকম জীবনের উপর্যুপরি উত্থাপন হল জীবনানন্দের উপন্যাসের প্রধান গুণ বা দোষ। তাঁর কথকতায় যেমন জীবন-নির্বাচনের ঐক্য রয়েছে, ঠিক তেমনি তৈরি হয়েছে জীবনবোধের অভিন্নতা। জীবনের মুখোমুখি জীবনানন্দ যেরকম আক্রান্ত, ক্লান্ত, পরাভূত ও

নিমজ্জিত হয়েছেন, তার বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন উপন্যাসে।

ছোট পরিসরের প্রথম পর্বের উপন্যাসের কাজ করেছেন জীবনানন্দ। বিষয়টি কবিতায় উত্তীর্ণ হতে পারত, যদি পরিসরটি আরো সংহত, সংকুচিত হত। জীবনানন্দের প্রথম পর্বের উপন্যাসের নায়কেরা অপ্রতিষ্ঠিত, অচরিতার্থ, ব্যর্থ ও হতাশ। প্রায় প্রত্যেকেই গ্রাম ছেড়ে কলকাতার মেসে গিয়ে ওঠে জীবিকার সন্ধানে। চাকরি না পাওয়ায় ক'মাস মেসের অন্ধকার ঘরে টিউশন করে অনিশ্চিত ও আশা-ভরসাহীন জীবন কাটায় এবং চাকরির সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবার পর পুনরায় গ্রামে ফিরে যায়। এই নায়কেরা সকলেই বিবাহিত, সাধারণত একটি দুই-আড়াই বছরের কন্যাসন্তানের জনক, বয়স তিরিশ থেকে পঁয়তিরিশের মধ্যে, বাবার রোজগারে দাম্পত্য জীবন ও সংসার চলে, বাবা মূলত স্কুল শিক্ষক, সহজ সরল, দরদী ও উপনিষদ দ্বারা চালিত। নায়ক ইংরেজিতে সেকেন্ড ক্লাস এম. এ., মানসিকতার দিক থেকে কারুতান্ত্রিক তথা লেখক। স্বভাবতই সমালোচক জানিয়েছেন — " 'কারুতন্ত্র' চাকরি না পাওয়ার প্রধান কারণ, কারুস্বভাবী হওয়ায় নায়ক নিরুদ্যম, সংসার জীবনে অদক্ষ; কারুতন্ত্রী নায়ক সামাজিক ব্যর্থতাকে, চাকরি না পাওয়াকে এবং অচরিতার্থতাকে তার স্বপ্ন কল্পনা প্রতিভার মাধ্যমে রিয়ালাইজ করার চেষ্টা করে।"[১]

জীবনানন্দ যে জীবনের কথা বলেছেন তা এতই ঘটনাহীন ও সাধারণ যে, তা নিয়ে কাহিনি বা উপাখ্যান রচনা অবান্তর। উপন্যাসের মধ্যে তিনি কেবলমাত্র জীবন-বিষয়ক কতগুলো বোধ ও বিশ্বাসকে উসকে দিয়েছেন। সে কাজ কবিতাতে করলেও, উপন্যাসে তা আর একটু বিস্তৃত। উপন্যাসগুলিতে যে এরই ছাপ পড়েছে তা উপন্যাসের আলোচনায় উঠে এসেছে।

জীবনানন্দের 'জীবনপ্রণালী' উপন্যাসে (১৯৩৩) শচীনের স্ত্রী অঞ্জলি তার বেকার স্বামীর ওপর যথেষ্ট বিরক্ত। সে বারবার স্বামীর অর্থশালী বন্ধুদের কথা ও নিজের বন্ধুদের ধনবান স্বামীর কথা বলে আহত করতে চেয়েছে স্বামী শচীনকে এবং পরোক্ষে সে নিজেই বিধ্বস্ত হয়েছে। এ উপন্যাসে আমরা দেখি — ঔপন্যাসিক জীবনের সফলতা ও বিফলতাকে পরিমাপ করতে চেয়েছেন বিপরীতধর্মী চরিত্রগুলিকে একত্র করে। 'পূর্ণিমা'তেও একই ব্যাপার — পূর্ণিমার বড় বোন চামেলি, যে কিনা বিধবা স্কুলের শিক্ষিকা ছিল ও পরে সে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল; তার সঙ্গে হঠাৎই বিয়ে হয়ে যায় বম্বের ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের বিরাজ নামের এক ডাক্তারের সঙ্গে। অন্যদিকে পূর্ণিমা তার দিদির তুলনায় রূপসম্পন্ন হয়েও সন্তোষের মতো বেকার স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে নিত্য অভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে দিন কাটায়। একদিকে চামেলি প্রবেশ করে 'অপরূপ

অসামান্য সম্পন্ন জীবনে'। আর একদিকে 'একটা বিপুল তামাশাবোধ' পূর্ণিমা ও সন্তোষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। মেসের অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সন্তোষ ভাবে সন্তানসম্ভবা পূর্ণিমার প্রসবকালে মৃত্যু ঘটলে এক ধরনের সমাধান হয়। এই ভাবনা বাস্তবেও রূপায়িত হয়। উপন্যাসের শেষে আমরা জানতে পারি — সমস্ত পৃথিবীর ভিতর পূর্ণিমা ছড়িয়ে পড়েছে প্রসবের ভোরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

রচনারীতির দিক থেকে ভিন্ন ধরনের উপন্যাস 'বিভা' (১৯৩৩)। সম্পন্ন ঘরের সংবেদনশীল একটি মেয়ে, যার নাম 'বিভা'। পাশের মেসের জানালা দিয়ে তার জীবনযাপন যতটুকু দেখা যায় বা বোঝা যায়, সেটুকুই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। যদিও সেই মেস বাড়ি ও বিভার ঘর মাঝে মাঝেই উপন্যাসে মিশে গিয়েছে। মনে হয়েছে, ঔপন্যাসিক যেন মেস বাড়ির জানালা দিয়ে নয় সরাসরি বিভাকে প্রত্যক্ষ করেছে। বিভার কাছে একাধিক যুবক আসে ও তাকে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু জীবনের অর্থ ও সার্থকতা বিভার চোখে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিভা ক্লাসিক সাহিত্য পছন্দ করে। আধুনিক সাহিত্যের সেক্সের বাড়াবাড়ি তার অপছন্দ। জীবনানন্দের উপন্যাসে একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সাহিত্য-বিষয়ক অক্লান্ত ও অবিরল সংলাপ — 'বিভা' উপন্যাসে তার আর একটি ঝলক চোখে পড়ে।

'কারুবাসনা' উপন্যাসের চরিত্রগুলোর জীবন নিরুত্তাপ ও নিস্তরঙ্গ, ঘটনা প্রায় কিছুই ঘটেনি। উপন্যাসের নায়ক হেম, তার স্ত্রী কল্যাণী। হেম এম. এ. পাশ, গত বছর কলকাতায় চাকরির খোঁজে বেরিয়ে ব্যর্থ মনোরথে দেশে ফিরে এসেছে। বৃদ্ধ স্কুল শিক্ষক পিতার রোজগারে তাদের সংসার চলছে কোনক্রমে। অন্যদিকে কলকাতা থেকে হেমের দাম্ভিক ও অবস্থাপন্ন মেজকাকা তাদের বাড়িতে এসেছেন। তাঁর আরাম-আয়েস ও ভালো খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে হেমের বাবাকে হিমসিম খেতে হয়। হেম নির্বিকার হয়ে থাকে। সে কিছু করতে পারে না বা করার চেষ্টাও করে না — সে উপলব্ধি করে, 'কারুবাসনা' তাকে নষ্ট করে ফেলেছে। হেমের কাকা হেমের চাকরির ব্যবস্থা অনায়াসে করে দিতে পারলেও, সে চেষ্টাও তিনি করেন না। যদুনাথের মতো লোকেরা হেমকে চামার হতে বা ডিমের ব্যবসা করতে, দুধ বিক্রি করতে বা মোটর ড্রাইভার হতে, এমনকি, চাষা হবার উপদেশ দেয়। ব্যর্থ, সংবেদনশীল ও হতাশ নায়ক অনুভব করে যে তার জীবনের কোন অর্থ বা প্রয়োজন নেই। সে দেখে তার স্ত্রী ও কন্যার জীবনও ব্যর্থ। অবসাদ ও ক্লান্তিতে আক্রান্ত হয়ে তার আত্মহত্যা করার ইচ্ছা হয়। তবে 'কারুবাসনা'র নায়ক আত্মহত্যা না করলেও, সেই বছরেই রচিত ছোটগল্প 'নিরুপম যাত্রা'র

(১৯৩৩) নায়ক প্রভাত প্রবল জ্বরে মেসের অন্ধকারে মৃত্যুবরণ করে।

'জীবনপ্রণালী' (১৯৩৩) উপন্যাসে নায়ক শচীন একসময় সাংবাদিক ছিল, বর্তমানে সে বেকার। তার বয়স চৌত্রিশ। সে বিবাহিত। এখানেও বৃদ্ধ বাবার আয়েই তাদের সংসার চলে। উপন্যাসের নিস্তরঙ্গ ও ঘটনাহীন কাহিনির মধ্যে হঠাৎ রজনীকান্ত খাসনবীশের ভুলবশত পাঠানো টাকা — শচীন ও তার স্ত্রী অঞ্জলির জীবনে বিলাসিতার জোগান দেয়। তবে রজনীকান্ত ভুল ভাঙ্গার পর অবিলম্বে টাকা ফেরত চাওয়ায় — হেম ও তার বৃদ্ধ পিতা টাকা জোগাড় করতে তটস্থ হয়ে পড়ে। শচীন ও অঞ্জলি দেখেছে শ্রীবিলাস, চন্দ্রনাথ, রাজেন, প্রতিমা — সকলেরই টাকা আছে। অমল একবার অঞ্জলিকে চিঠি পাঠিয়ে শচীনের দরিদ্র সংসার থেকে তার কাছে চলে আসতে আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু অঞ্জলি দারিদ্র্য ও নারীত্বে অহংকারবশতঃ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মূলত শচীনের জীবন পুরোপুরি ব্যর্থ। মানুষের ব্যর্থতা যেমন মর্মবিদারক, শচীনের ব্যর্থতা তার থেকে ভিন্ন তবুও যেন একেবারে ভিন্নও নয়। এরকম অবস্থায় মানুষ কতদিন বা কতদূর বাঁচতে পারে সেই ক্লান্ত ও করুণ জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে।

'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাসের নায়ক সুকুমার ইংরেজিতে এম. এ. পাশ ও ইংরেজি সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। তার প্রিয় বই প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক টমাস মানের 'বাডেনব্রুক্স'। একটি অভিজাত বংশ কিভাবে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেল — তারই ইতিহাস এই 'বাডেনব্রুক্স'। উপন্যাসে দেখা যায় সুকুমারও পোড়ো-জমিদার বংশের ছেলে। তার মাঝে মাঝে মনে হয় ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. না করে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হলে ভালো হত, কিংবা তার মাঝে মাঝে জুতো সেলাই শিখতে ইচ্ছে করে। সে বিবাহিত ও বছরের পর বছর চাকরিবিহীন। সে চাকরির সন্ধানে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ও পথে যেতে যেতে তার পূর্ব প্রেমিকা বিনতার কথা মনে করে — বর্তমানে সে সুকুমারের জীবনে শুধুমাত্র ইতিহাস তথা প্রেতিনী।

এছাড়া তিরিশের দশকে জীবনানন্দ আরও যে চারটি উপন্যাস রচনা করেন, তার মধ্যে 'বিরাজ' (১৯৩৩) অসম্পূর্ণ। 'মৃণাল' (১৯৩৩) উপন্যাসের নায়িকা মৃণাল 'বিভা'র মতোই গড্ডলিকা প্রবাহে দিন কাটাত, তবে নিয়তির অমোঘ বিধানে যৌবনেই সে থাইসিস রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আর 'কল্যাণী' উপন্যাসে বনেদি পরিবারের অহং-ভাব বজায় রাখতে কল্যাণীর পরিবার তাকে প্রায় বিসর্জন দিয়েছে। কল্যাণী হয়েছে প্রতারণার শিকার, কিন্তু নারীত্বের ওপর জয়ী হয়েছে তার স্ত্রী ও মাতৃ সত্তা। আর 'জীবনের উপকরণ' উপন্যাসে অজিত-পূর্ণিমার

থিয়েটার জীবনের পাশাপাশি বনেদি পরিবারের মেয়ে শচীর বিধবাদের স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি করার অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন দেখানো হয়েছে।

প্রায় এক যুগের বেশি সময় পর জীবনানন্দ পুনরায় উপন্যাস রচনায় হাত দেন। এগুলোই তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। জীবনানন্দের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলি অপেক্ষাকৃত বড়, দীর্ঘ ও বৃহৎ পরিসরে নির্মিত। উপন্যাসগুলি কোন না কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, তার ক্যানভাস ও পটভূমিকা তুলনামূলকভাবে সম্প্রসারিত। কবি জীবনানন্দ এখানে প্রকৃত অর্থে কথাসাহিত্যিক তথা ঔপন্যাসিক হয়ে উঠতে চেয়েছেন।

জীবনানন্দের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে মাল্যবান (১৯৪৮) অপেক্ষাকৃত ছোট ও সুলিখিত। 'মাল্যবান'কে অনেকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলে থাকেন, কিন্তু জীবনানন্দের প্রতিটি উপন্যাসেই কিছু না কিছু আত্মজীবনীর উপাদান রয়েছে। তবে একথা সত্য যে, জীবনানন্দের আত্মজীবনের টেক্সটের সঙ্গে 'মাল্যবানে'র টেক্সট মিলিয়ে পড়া যায়। তবে সেই পাঠই একমাত্র আদর্শ পাঠ নয়। মাল্যবান ও উৎপলার টানাপোড়েনের সংসার। উৎপলা দোতলার বড় ঘরে মেয়ে মনুকে নিয়ে ঘুমোয়। আর মাল্যবান নিচের অন্ধকার ঘরে একাই থাকে। মাল্যবান যৌনতাড়িত স্বামী, কিন্তু উৎপলা স্বামীকে নিজের শরীর ব্যবহার করতে দেয় না। এমনকি, উৎপলা জানায় — একটা বেশ্যার সঙ্গে যদি সে তার স্বামীকে ভাগ করে নিতে পারত, তাহলেও বেঁচে যেত। এভাবেই চলতে থাকে মাল্যবানের বারো বছরের দাম্পত্য। এরপর উৎপলার মেজদা ও মেজবৌদি তাদের বাড়িতে এলে স্থানাভাবের দরুণ মাল্যবান মেসে গিয়ে ওঠে। মেস থেকে ফিরে এসে দেখে উৎপলার কাছে রোজ অমরেশ নামে একজন আসে ও অনেক রাত পর্যন্ত থাকে। মাল্যবান কিছুই বলে না। তবে উপন্যাসের শেষে দেখা যায় অমরেশকে নিয়ে মাল্যবান ও উৎপলার বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এরপর মাল্যবানের 'লিবিডো' (মগ্ন চৈতন্যের যৌনতাবোধ) শীতরাতে স্বপ্ন দেখে — সে ওপরের ঘরে উৎপলার পাশে এসে শুয়েছে — তার শরীর ব্যবহার করেছে। সেই দম্পতি যেন বিভোর হয়ে কোরাস ধরেছে —

"কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?
ফুরুবে না। ফুরুবে না, কোনোদিন —"

'জলপাইহাটি' (১৯৪৮) উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় নিশীথ পূর্ববঙ্গের মফস্বল শহর 'জলপাইহাটি' থেকে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় ঐশ্বর্যশালী বন্ধু জিতেন দাশগুপ্তের বাড়িতে এসে ওঠে। জলপাইহাটিতে সে অধ্যাপক ছিল। তার স্ত্রী সুমনা রক্তাল্পতা রোগে আক্রান্ত, এক

মেয়ে রানু কোথায় হারিয়ে গেছে, অন্য মেয়ে ভানু থাইসিসে আক্রান্ত হয়ে কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে পড়ে রয়েছে। বিপ্লবী ছেলে হারীত জলপাইহাটিতে ফিরে এসে ভাবতে থাকে স্বাধীন বাংলাদেশে বিপ্লব সম্ভব কিনা। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্চনা-সুলেখা-জুলেখাদের সঙ্গে নানারকম সম্পর্কে জড়িয়ে, তার বিপ্লবাত্মক মানসিকতা ক্রমে ক্রমে খানিকটা অবসন্ন ও শিথিল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সেকেন্ড ক্লাস এম. এ. দিয়ে নিশীথ কলকাতায় অধ্যাপনার চাকরি জোটাতে ব্যর্থ হয়। স্ত্রী সুমনা যেদিন মারা যায় সেদিনই নিশীথ কলকাতা থেকে প্রত্যাবর্তন করে। চাকরি হয়তো সে পায়নি।

'বাসমতীর উপাখ্যান' (১৯৪৮) আয়তনের দিক থেকে বিপুল ও বহুল চরিত্রের সমাবেশে নির্মিত। কেন্দ্রীয় চরিত্র যদিও সিদ্ধার্থ, তবুও এতে পরিপ্রেক্ষিত চরিত্র ও তাদের গুরুত্ব কম নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে গরিব অধ্যাপক সিদ্ধার্থের স্ত্রী সুনীতি ও ছেলেমেয়ে রয়েছে। এছাড়া সরোজিনী ঠাকরুণ, ছাতুকাকা ও টিনি মজুমদার সিদ্ধার্থদের বাড়িতে থাকেন। এদের সকলের মধ্যে একটা জায়গায় মিল হল — এদের কারো কাছে অর্থ নেই। সিদ্ধার্থের মাঝে মাঝে কলকাতা যাবার ইচ্ছে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। বাসমতী কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী রমার প্রতি সিদ্ধার্থের দুর্বলতা থাকলেও সে নিজের সীমা ও সাধ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই সে সংযত। মূলত বইপত্রকে কেন্দ্র করে রমা ও সিদ্ধার্থের আলাপ জমে ওঠে। এছাড়া ফাটা মজুমদার, বনচ্ছায়া চরিত্রগুলিও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। এসবের মধ্যে দেশভাগের টেনশনকে জীবনানন্দ তাঁর 'বাসমতীর উপাখ্যানে' তুলে ধরেছেন। এই রাজনৈতিক অনুষঙ্গের কারণে 'বাসমতীর উপাখ্যান' উপন্যাসটি আমাদের মনে এক ধরনের কৌতূহল সৃষ্টি করে।

এছাড়া 'সুতীর্থ' জীবনানন্দের দ্বিতীয় পর্বের বিশেষ উল্লেখযোগ্য একখানি উপন্যাস। উপন্যাসের সমাপ্তিতে নায়ক ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের গন্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর মানুষের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় শহর থেকে গ্রামে পাড়ি দিয়েছিল।

আগাগোড়া একজন ব্যর্থ মানুষের ছবি টাঙিয়ে ধরেছেন জীবনানন্দ তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই। উপন্যাসের নায়ক-সত্তা ও লেখক-সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই। সাহিত্য-তৃষ্ণা কাতর সেই ব্যর্থ মানুষটির ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই। মানুষটি যেন অনিবার্য ও নির্ধারিত ভাবেই ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা থেকে উত্তরণও বোধহয় তার কাম্য নয়। সংলাপের পর সংলাপ বিন্যস্ত করে উপন্যাসের কায়া নির্মাণ হয়। আধুনিক বাক্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর বাক্যে কমা-কোলন-ড্যাশ-এর বহুল ও জটিল ব্যবহার চোখে পড়ে। চরিত্রগুলির

আলাপের ভঙ্গি সাধারণত নিরুত্তাপ ও মন্থর। জীবনানন্দ নিসর্গলোকের উপাদান সংলাপের বাইরে ও ভিতরে বার বার তুলে ধরেছেন। সেদিক থেকে উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্পের প্রাচুর্য বেড়েছে। তবে প্রকৃতি এখানে চরিত্র হিসেবে নয়, আলংকারিক উপাদান হিসেবে প্রযুক্ত। জনৈক সমালোচক জীবনানন্দের উপন্যাস সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন — "আত্মজৈবনিকতা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মহত্ত্ব কিছুমাত্র কমে না, কিন্তু আত্মজীবনের প্রায় সমস্ত উপাদানের দ্বিধাহীন অনির্বাচিত স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার জীবনানন্দের উপন্যাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।"[২]

জীবনানন্দের লেখাগুলির মধ্যে মূলত বৈচিত্র্যের অভাব। তিনটি কি চারটি চরিত্র ঘুরে-ফিরে আসে, সবটা মিলিয়ে তিন-চারটি বিষয়ের প্রকাশেই তাঁর মনোভাবনা সংহত ও সেগুলিতে অজস্র পুনরুক্তি। অন্যান্য বাংলা গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে কোনপ্রকার সাদৃশ্য না দেখা গেলেও সেগুলির পরস্পরের সঙ্গে এত মিল যে এগুলিকে একে অন্যের পরিপূরক এবং মাঝে মধ্যে একঘেয়ে বলে মনে হতে পারে। এমন অনেক ঔপন্যাসিক আছেন যাঁরা তাঁদের জীবনকে বিচিত্র বিকাশের নানা বর্ণে দেখেন। তাঁদের যে কাজ — এক সজীবতার স্বাদ নেওয়া ও সেই স্বাদ পাঠককে দেওয়া — তাদের স্রষ্টার আনন্দ সেই কাজেই। কিন্তু সে জাতীয় একান্ত নান্দনিক কোন লক্ষ্য ছিল না জীবনানন্দে। তিনি কবিতায় ধরতে পারছিলেন না বলে মনে হয়েছিল — জীবন সম্পর্কে তাঁর জটিল কিছু চিন্তা — তা তিনি গদ্যে প্রকাশ করতে চাইছিলেন বারবার। এই কারণেই তাঁর গল্প-উপন্যাসে একই কথা বারবার বলা হয়। গল্পের বড় সংস্করণ বলে মনে হয় উপন্যাসগুলিকে। তাই বার বার ফিরে আসে একই ধরনের চিন্তা-পদ্ধতি-সংলাপ-ঘটনা সংস্থান। ঠিক জীবনরসে রসময় নয়, তত্ত্বভাবনায় জটিল তাঁর গল্প-উপন্যাস। এই তত্ত্বময়তার বিস্তার দেখা যায় তাঁর শেষ পর্বের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলিতে। হয়তো প্লট বা চরিত্র নির্মাণে তিনি সর্বাঙ্গীণ যত্ন নেননি — উপন্যাসকে শিল্পসৃষ্টির আনন্দে মিশিয়ে নিতে পারেননি বলে। তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্লট থাকে শিথিল, চরিত্রগুলির কাজকর্মগুলিকে মনে হয় প্রায় অসম্ভব এবং স্বাভাবিক বস্তুবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাদের মনে হয় অদ্ভুত। এসব সত্ত্বেও তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি চিন্তাশীল পাঠকের কাছে অতীব সুপাঠ্য, কোন অংশেই অসার্থক বা দুর্বল নয়।

জীবনানন্দের উপন্যাসে মানুষের আত্মিক সংকটের কথাটাই প্রধান — যদিও পরিবেশ সংকটেরও উপস্থাপনা রয়েছে। তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার এটাই জটিলতম অধ্যায় এবং তৃতীয় স্তর।

বেঁচে থাকার বিষয়ে কিছু নতুন কথা এখানেও তিনি বলেছেন। উপন্যাসে এভাবে কেউ বলেননি, যদিও কথাগুলি সবই নতুন নয়।

মানুষের বেড়ে ওঠার সঙ্গে যেখানে পারিপার্শ্বিকের সংঘাত — এ জাতীয় পরিবেশ সংকট নিয়েই সবসময় উপন্যাস লেখা হয়। এমন অন্তর্মুখী ভাবনার উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই — বেঁচে থাকার অর্থ ও সার্থকতার বিষয়ে মানুষের মনে যে নিরন্তর ঘর্ষণ — শুধু তাকেই প্রকাশ করবে। জগদীশ গুপ্তের লেখায় সেরকম কিছু উপকরণ থাকলেও, নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে মিশে যাওয়ার থেকে কিন্তু নিজেকে তিনি সাবধানে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই জাতীয় অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার ছায়া মাঝে মাঝে তাঁর বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখায় পড়লেও শেষ পর্যন্ত তা সমাজ বিশ্লেষণ ও নানা জনের উপাখ্যান হয়ে দাঁড়ায়। তা লেখকের আত্মার দর্পণ হয়ে না উঠলেও সেখানে লেখকের আত্ম প্রক্ষেপ থাকে। এই ধরণটি কিছুটা দেখা গেছে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সংকট' বা 'দিগভ্রান্ত' উপন্যাসে।। এর পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেও কিছুটা চোখে পড়ে। যেখানে উপন্যাসের মুক্তি একটি আত্মিক প্রশ্নকে অনুসরণ করে। অবশ্য সেখানেও কিন্তু একটি গল্প বলার ইচ্ছে রয়েছে। আর রয়েছে আরও পাঁচটা দিক তুলে ধরবার চেষ্টা। কিন্তু শুধু নিজের প্রশ্নগুলি সারাক্ষণ কাঁটার মত উঁচিয়ে থাকে জীবনানন্দের উপন্যাসে — - আমি কি? আমি এমন কেন? আমার কি হওয়া উচিত? আমি কি আর কিছু হতে পারি? — তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলির মূলকথা (প্লট সাজানোর বাস্তব বর্ণনার কোন দায় তিনি স্বীকার করেননি) আত্ম-সত্তার মুখোমুখি উক্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে এসে দাঁড়ানোয়।

নৈরাশ্য পীড়াকে উপস্থাপন করেছেন আলবারকাম্যু তাঁর উপন্যাসে, এই আত্ম-যন্ত্রণা অসুস্থতার পর্যায়ে পৌঁছেছে কাফ্‌কার লেখায়, সাতের রচনায় কখনও বিবমিষা বোধ জাগিয়েছে বেঁচে থাকার অর্থহীনতা। ভার্জিনিয়া উলফ্-এর উপন্যাসে আবার মৃত্যু-বোধ স্পর্শী এক সুগভীর ঔদাস্য অনুভব করা যায়। এঁদের রচনাই এঁদের আত্মদর্পণ। জীবনানন্দ বোধ হয় বাংলা উপন্যাসের একমাত্র নাম। অবশ্য ঠিক চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির নয় জীবনানন্দের লেখা — তাঁর রীতির মূল কথাই হলো আত্মসত্তার অবাধ উন্মোচন — জীবনানন্দের রচনায় এটা পাওয়া যায় বলেই তাঁর রচনা পদ্ধতির সঙ্গে চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির মিল আছে। উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী দর্শনে ফলিয়ে তুলতে গেলে তার উপকরণ হয় ব্যক্তির অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা ও সংঘাত। বাংলা সাহিত্যের এই বোধেরও কাছাকাছি জীবনানন্দের উপন্যাস। কাহিনী রম্যতার দিকে তিনি কোন সময়ই দৃষ্টি দেননি। চরিত্রগুলির অদ্ভুত ধরনের আচরণ ও একান্ত উদ্ভট ধরনের সংলাপ বিবৃত

করেছেন। উপন্যাসের শেষও করেছেন আপাত খাপছাড়া গ্রন্থনায়। সেই কারণেই তাঁর উপন্যাসে স্বাভাবিক বাস্তবতার বদলে মগ্নচেতনার নিরাবরণ ও অমার্জিত চেহারাটিতে বাস্তবতার তলশায়ী নিবিড়তর এক বাস্তবতার অনুভব পাওয়া যায় অনেক সময়ই। বাংলা উপন্যাসে একমাত্র তাঁর উপন্যাসেই পাওয়া যায় "সুররিয়ালিজমে"র ছোঁয়া — একথাও হয়তো বলা যায়।

জীবনের বিচিত্র বিস্তারের বোধে নয়, ব্যক্তি হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ হবার লক্ষণ আক্রান্ত আধুনিক মনন। এইজন্যেই আজকের উপন্যাসে ব্যক্তির অভ্যন্তর মনকে অনুপুঙ্খে দেখবার প্রবণতা। আর তাই মনের ভেতরের শুধু একজনেরই চেহারা দেখানো সম্ভব। তা হল নিজের। এই প্রবণতা জীবনানন্দের প্রথম উপন্যাসটি থেকেই স্পষ্ট। বস্তুত 'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাসের পর তাঁর উপন্যাসে আর 'মায়ের চরিত্র' দেখা দেয়নি। যদিও মা ও সন্তানের একত্র উপস্থিতি রয়েছে 'মাল্যবান' ও 'জলপাইহাটি'তে — তবুও মানবিক মাতৃভাব সেখানে অনুপস্থিত। বাংলা উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত যে মাতৃমূর্তিটিকে পরবর্তীকালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পর্যন্ত প্রায় অবিকৃত রেখেছিলেন — উত্তর আধুনিককালেও যে ধারার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না — — জীবনানন্দ তাকেই প্রবলভাবে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের জননীরা যে তাদের সন্তানকে বিরক্তি-ক্রোধ-বিরাগ বা বিকৃতির চোখে দেখে তাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। যদি হত, সেও একরকমের টান হত। জননী যেন সন্তানকে দেখেও দেখে না। পশু-পাখির প্রবৃত্তিময় জগতে গর্ভস্থ সন্তান বড় হয়ে গেলে জননীর কাছে তার যেমন প্রায় অস্তিত্বই থাকে না, সেইরকমই জীবনানন্দের উপন্যাসের মায়েরা। ব্যতিক্রম শুধু 'প্রেতিনীর রূপকথা'। জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর মায়ের যে স্থান ছিল তারই প্রতিফলন উক্ত উপন্যাসে।

জীবনানন্দের মনোগঠনের সঙ্গে তাঁর উপন্যাসের নায়কদের সাদৃশ্য বিতর্কিত। তাঁর উপন্যাসের নায়কদের জর্জরিত করে শরীর-মনের আকাঙ্ক্ষা, সমাজের সঙ্গে সংঘাত, অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সার টানাপোড়েন। সন্তোষ, হেম, শচীন, সুকুমার, মাল্যবান, নিশীথ, সিদ্ধার্থ, সুতীর্থ জীবনানন্দের উপন্যাসের নায়কেরা প্রত্যেকেই প্রায় একই সমস্যার শিকার। তাঁর কবিতায় বহু ব্যবহৃত 'শিকার' শব্দটি। "অই মৃত মৃগদের মতো আমরা সবাই" ('ক্যাম্পে', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি') — এতো তারই অন্তরের অভিব্যক্তি। তাঁর জীবন ও জীবনতত্ত্বের গভীরে খোদিত স্বাক্ষর তাঁর উপন্যাসগুলি।

এ পর্যন্ত প্রবণতাগুলির সন্ধান গদ্যশিল্পী জীবনানন্দের রচনায় পাওয়া গেছে তা হল —

সংসারের কদর্যতার প্রতি বিরাগ, পারিবারিক জীবনে অতৃপ্তি এবং প্রেম ও যৌনতা। সেইসঙ্গে প্রকৃতির রূপ-রহস্যময় বাতাবরণ সম্পর্কে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বোধ ও মুগ্ধ অতীত চারণ। কিন্তু এই নকশাটির বদল ঘটে। কারণ, পরবর্তী পর্যায়ে এই নকশার মধ্যে ঢুকে পড়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এরপর থেকে তাঁর লেখায় ধ্বনিত হতে থাকে এই গভীর সত্যটি। মানুষের জীবনের অর্থের প্রয়োজনবোধ এবং সেই প্রয়োজনবোধ অনুসারে প্রতিটি মানুষের জীবনের গড়ন নির্মিত হচ্ছে। কেউ কেউ জীবনানন্দের উপন্যাসগুলির হেরে যাওয়া নায়ক ও পরিণামী হতাশার কথা ভেবে বলেন যে, তাঁর লেখক-স্বভাব ছিল জীবনসংগ্রাম থেকে পলাতক। ঘটনাটি সত্য যে, তাঁর লেখায় উত্তরণের বা জয়ের কথা ততটা নেই যতটা রয়েছে নৈরাশ্য, মৃত্যু, পরাজয়ের কথা। কিন্তু তিনি জীবন থেকে পালিয়েছিলেন এই সিদ্ধান্তটি হয়তো নির্ভুল নয়। টাকার বাজনা বাজানো পৃথিবীতে একদল মানুষ আছেন যারা সত্যিই একটু একপাশে সরে থাকে। একা লড়াই করে তারা জিততে পারে না পণ্যাভিত্তিক সভ্যতার রীতি নীতির সঙ্গে। তারা আশ্রয় পান না কোন আত্মসান্ত্বনাতেই। এরকম একজন মানুষ ছিলেন জীবনানন্দ নিজে। যদিও তাঁর নায়কেরা সাময়িকভাবে হেরে গেছে, কিন্তু হেরে যাওয়া আর পালিয়ে যাওয়া তো ঠিক সমার্থক নয়! যদিও তাদের কোন দল ছিল না বা "দিন আসছে — আসবে" জাতীয় কোন সরল বিশ্বাসও ছিল না তবুও তারা সকলেই ছিল সচেতন সৈনিক, সকলেই তারা নিজের মতো করে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে সমাজের সঙ্গে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে।

জীবনানন্দের নারী চরিত্রেরা সকলেই হিসেবি, শারীরিকতা, ভোগ-বাসনা, সাংসারিকতা আর বুদ্ধির সমন্বয়ে গড়া। এক ধরনের প্রখর ইন্টেলেক্টের সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে। তাদের হৃদয়াবেগ থাকলেও তার প্রাবল্যে নিজেদের ভোগ-সুখ সর্বস্ব জগৎটিকে তারা কিছুতেই বিচলিত হতে দেয় না। সম্ভবত নারীকে সংসারে এমনি দেখেছিলেন জীবনানন্দ তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায়। ভারতীয় মানসিকতায় প্রধানত দেখা যায় নারীকে স্নেহময়ী ও প্রেমময়ী রূপে। জীবনানন্দ তার থেকে ব্যতিক্রম। তাঁর কাব্যসাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখা যায় রহস্যময়ী এক প্রেমিকাকে কিন্তু উপন্যাসে স্বপ্নচারিণী বিনতাই শুধু তার উদাহরণ। বাস্তব সংসারে স্থাপন করা হয়নি কবিতার বনলতা, শঙ্খমালাদের বা উপন্যাসের বিনতাকে। তারা শুধুই কল্পনায় দেখা দেয় প্রেমিকের মনোজগতে স্মৃতির দূরত্ব নিয়ে। আবেগ ও গার্হস্থ্য সংসার বর্জিত এই রমণীদের একটি আত্মিক অন্বেষণও আছে তাঁর উপন্যাসে। অস্তিত্বের মূল্যবোধ সম্পর্কে, নিজস্ব জিজ্ঞাসা তাদেরও আছে। তাদের কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছে বুদ্ধিচালিত একটি স্বাধীন পথ।

'জলপাইহাটি'র নমিতা বা জুলেখা, 'সুতীর্থ'-র জয়তী — এই জাতীয় রমণী চরিত্র। আবার কেউ কেউ অস্তিত্বের সেই পূর্ণতাবোধকে স্পর্শ করে নিখাত শরীর লিপ্সার পথেই। যে পথে বেঁচে থাকার অদম্য তৃষ্ণা মিটিয়ে চরিতার্থ হয় জীবজগতের যাবতীয় প্রাণময় সত্তা। 'মাল্যবান'-এর উৎপলার মধ্যে এই ধারাটি রূপ নিয়েছে।

গল্প আর উপন্যাস যে দুটি ভিন্ন শিল্পরূপ — এই পার্থক্য জীবনানন্দের ক্ষেত্রে খুব বড় হয়ে উঠবে না। প্রায় একই রকম দুটি রীতিতে একই ভাবনা তিনি উপস্থিত করেন। চরিত্রগুলি নিজেদের মনোগ্রন্থিগুলিকে উন্মোচিত করে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, আর গল্পগুলিতে সময়ের পরিসর কম। তাদের বিচরণভূমি ও অবস্থানকাল উপন্যাসে আরও একটু প্রসারিত। কিছু একটা ঘটে উঠতে দেখা যায় চরিত্রগুলির জীবনের ক্ষেত্রে। যদিও তা মন্থর তবুও একটা গতি আছে। অনালোকিত সুড়ঙ্গ পথে বৃত্তাকার আবর্তন — সূক্ষ্ম এবং অনেকক্ষেত্রে তার সরল অগ্রগতি নয়। তাঁর গল্প ও উপন্যাসের রচনা পদ্ধতি এইটুকু বাদ দিলে প্রায় একইরকম।

তাই বলা যায়, জীবনানন্দের উপন্যাসকে সংস্কারমুক্ত স্বাধীন পাঠের আওতায় ফেলা যায় না। বই পড়তে গিয়ে আমরা বইয়ের সঙ্গে লেখককে, বইয়ে প্রতিফলিত সংস্কার-স্বপ্ন-সন্ত্রাসকে এমনকি লেখকের কিংবদন্তিকেও পড়ি। সে ঘটনা জীবনানন্দের উপন্যাস পড়তে গিয়েও ঘটে — বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক সালাহউদ্দীন আইয়ুব-এর মতে, "জীবনানন্দের উপন্যাসে জীবনানন্দের কবিতা পড়ব, তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কিংবদন্তীকে পড়ব; উপন্যাসের নায়িকাগুলোকে মিলিয়ে নেব তাঁর কবিতার সুরঞ্জনা-বনলতা-শেফালিকার সঙ্গে, আর 'নায়ক' হিসেবে অধিষ্ঠিত দেখব একজনকে ঃ ইংরেজিতে এম. এ. পাশ, কলেজ অধ্যাপক, বিবাহিত, অসুখী, এক কন্যা ছেলের অসম্পূর্ণ জনক ট্রামস্পৃষ্ট কবি জীবনানন্দ দাশ।"[৩]

জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসে ঘুরে ফিরে আসে শিক্ষিত যুবকের বেকারত্বের কাহিনি, মফস্বল শহর বা কলকাতা নগরের প্রেক্ষাপটে তাদের রোজনামচা। সংসারের অর্থসঙ্কট, নিদারুণ দারিদ্র্য, পূর্ববঙ্গীয় মফস্বল শহরের গৃহস্থাপত্য, সেইসব পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের নানা গতিবিধি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কলকাতা শহরের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, মেস, অফিস, বোর্ডিং, ট্রেন বা স্টিমার যাত্রা প্রভৃতি বহুমুখী গতি-প্রকৃতি জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। অখন্ড বাংলার পুঙ্খ-অনুপুঙ্খ বর্ণনায় জীবনানন্দের উপন্যাস স্বকীয়তা লাভ করেছে। এদিক থেকে অবশ্য তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনীয় ব্যক্তিত্ব। দেশভাগ হবার পূর্বেই পূর্ববাংলার ও কলকাতার হিন্দু মধ্যবিত্তের মনোভাবের প্রতিক্রিয়ার কথা এমন অনায়াস সাধ্যে প্রথম লিখে

গেছেন হয়তো জীবনানন্দই। বাহ্যিক জগতের সঙ্গে সঙ্গে যৌন অতৃপ্তি ও অসম্পূর্ণ দাম্পত্য তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাতায় উঠে এসেছে — তাতে তাঁর আত্মজীবনীর খানিকটা ছোঁয়া থাকলেও জীবনানন্দের কথাসাহিত্যকে 'আত্মজীবনীমূলক' বলাটা পুরোপুরি সঠিক নয়। কারণ জীবনানন্দ দাশ কথাসাহিত্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এসে আমাদের একটি অভিনব শিল্পরূপ দান করে গেছেন।

ষাটের দশকে অস্তিত্ববাদী দর্শন নিয়ে যে কথাসাহিত্যের অভ্যুত্থান — জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসগুলি যদি যথাসময়ে প্রকাশিত হত তবে সে সকল কথাসাহিত্যিকগণের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে বিলম্বিত হত। জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শন বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও বলা যায় ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে তিনি ক্রমশই অস্থির চিত্ত হয়ে উঠেছিলেন। মধ্যবিত্ত মনন-মানসিকতা ও সর্বোপরি আহার-নিদ্রা-মৈথুনের মধ্যে দিয়েই কালাতিপাতের বিরুদ্ধে এক ধরনের তীব্র অভিযোগ ছিল জীবনানন্দের। অথচ তাদের নিয়ে কিছু প্রত্যাশাও ছিল। জীবনানন্দ সেই প্রত্যাশার বলয় থেকে কোনদিন বের হননি বা হতে চাননি। জীবনানন্দের বিষয়বস্তু 'মধ্যবিত্ত জীবন পরিধির মৃত্যু ব্যথা নিরাশ্বাস ক্ষয়'-এর আবহমন্ডলে নির্মিত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

১। মুক্তপাঠ ঃ মহৎকবির কথাশিল্প/সালাহউদ্দীন আইয়ুব, উৎস - জীবনানন্দ দাশ ঃ জন্মশতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত, পৃষ্ঠা - ১৪৪, প্রকাশক - এফ. রহমান, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা - ১১০০, প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি ২০০১

২। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪২

৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৯